গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথ

- নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট মনীষীদের জীবন চর্চা নানাভাবে আমাদের প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিপুল ভুবনের পাশাপাশি তাঁর চলা-ফেরা, হাতের লেখা, পোশাক পরিচ্ছদ, ব্যক্তিগত জীবন -- সব কিছুই গভীরভাবে প্রাণিত করেছে আমাদের। রবীন্দ্রনাথকে আজও আমরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধার যে নির্বিকল্প আসনে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছি তার একটা মূল কারণ, রূপে-গুণে, মেধায়-মননে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় সম্পৃক্ত এমন একটি আদর্শ ব্যক্তিত্বই হয়তো আমরা দেখতে চেয়েছি বরাবর।

জীবন স্মৃতি, ছেলেবেলা বা আত্মপরিচয়-এর মতো আত্মকথনমূলক রচনা ছাড়াও অসংখ্য চিঠিপত্রে, ভ্রমণকথায় ছড়িয়ে আছে "মানবের লোকালয়ে", "সুখে-দুঃখে", "লাজে-ভয়ে", "জয়ে-পরাজয়ে" ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহু উপাখ্যান। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত রয়েছে। ইংরেজিতে এই ধরণের গল্পের একটা চালু নাম হল "অ্যানেকডোট"। এই প্রবন্ধে যে সব কাহিনী সংকলিত হয়েছে তার প্রতিটি কোথাও-না-কোথাও প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এই সব কাহিনী বিশেষ প্রকাশিত হয় নি। তাই আমাদের জানার প্রায় সুযোগ নেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে ঘিড়ে গড়ে-ওঠা এই-সব কাহিনীগুলির বিষয়ে কি মতামত পোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে গড়ে ওঠা অজস্র কাহিনীর মধ্যে থেকে আমার ভাল লাগা কিছু গল্প নিয়েই এই লেখা --

সহজ পাঠ

অভিজিৎ একান্ত সচিব অনিল চন্দ ও রানী চন্দের ছেলে। চার বছরের ছোট্ট এই ছেলেটি প্রায় ঘুরে-ফিরে আসে তার গুরুদেব-দাদুর কাছে। একদিন গুরুদেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াল অভিজিৎ। বলল, "জান, তোমার সব কবিতা আমি মুখস্ত করে ফেলেছি।" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তাহলে তোমার জন্য আবার আমায় নতুন করে কবিতা লিখতে হবে দেখছি।" এর পর অভিজিৎ গুরুদেবের কোলে হাঁটুটা তুলে দিয়ে বলল, "আজ কোন্ কবিতাটা শিখেছি ? শোন -- পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল -- / সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরণ / হইল ধরণীতল।"

রবীন্দ্রনাথের "প্রাণাতীত দান" কবিতায় পাঠানের "পাঠা" আর রক্তবরণের "রক্ত" -- এ দুটো শব্দই বোধগম্য হয়েছিল অভিজিতের। তাই অভিজিৎ বলল, "এর মানে কি জান দাদু ? পাঁঠাগুলিকে বেঁধে নিয়ে এল -- কাটল, আর রক্ত -- রক্ত।" ছোট্ট হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চোখ ছানাবড়া করে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থাটাই বুঝিয়ে দিল অভিজিত তার গুরুদেব-দাদুকে। প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, "তাই তো গো -- এমন মানে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানে না গো !"

(সূত্র : রানী চন্দ, গুরুদেব, বিশ্বভারতী, কলকাতা : ১৩৬৯)

নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ। মংপু থেকে অচেতন কবিকে কলকাতায় নিয়ে এলেন মৈত্রেয়ী দেবী। কবির সেবার দায়িত্ব পড়ল মৈত্রেয়ীর উপরই। রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করছেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। কঠিন স্বরে তিনি মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো দাঁত খুলে নেওয়া হয় নি কেন ?" মৈত্রেয়ী বললেন, "খুলেছি, পরিষ্কার করে আবার পরিয়ে দিয়েছি।" বিধানচন্দ্র শাসনের সুরে বললেন, "পরালে কেন ? তুমি জানো না অচৈতন্য মানুষের শরীরে এ -সব রাখতেই নেই।"

ভুল বুঝে মৈত্রেয়ী অচেতন রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো দাঁতজোড়া খুলে নিলেন। জ্ঞান ফিরতেই রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন তাঁর দাঁত উধাও। বললেন, "আমার কথা কেড়ে নিয়ে গেল কে ? রবীন্দ্রনাথকে বাক্যহারা করে কার এত সাহস ?"

(সূত্র - মৈত্রেয়ী দেবী, স্বর্গের কাছাকাছি, কলকাতা - প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স্, ১৯৮১)

প্রাণের পরে চলে গেল কে

একবার রবীন্দ্রনাথের বিয়ের একটি সম্বন্ধ এল। রবীন্দ্রনাথ গেলেন মেয়ে দেখতে। ধনী ঘরের মেয়ে। সেই সময় সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী। মেয়ের বাড়ি যেতেই দুটি অল্প বয়সী মেয়ে এসে বসলেন। একজন নিতান্তই সাদাসিধে, জড়ভরত, অন্যজন পরমা সুন্দরী চট্‌পটে আর স্মার্ট। বিশুদ্ধ তার ইংরিজি উচ্চারণ। দ্বিতীয় জনকে ভাল লেগে গেল রবীন্দ্রনাথের। ভাবলেন, এবার মেয়েটাকে ভাগ্য করে পেলে হয়।

সেই সময় ঘরে ঢুকলেন গৃহকর্তা। বয়স হয়েছে। সৌখিন মানুষ। জড়ভরত মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন "হেয়ার ইজ মাই ডটার" অর্থাৎ "এই আমার মেয়ে।" আর পরমা সুন্দরীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "হেয়ার ইজ মাই ওয়াইফ, ইনি আমার স্ত্রী।" রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সে বিয়ে আর হয় নি।

পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিয়েটা হলে নিতান্ত মন্দ হত না, কেননা পত্নীর সুবাদে সাত লাখ টাকার মালিক হলে বিশ্বভারতীর অর্থকষ্টে তাঁকে আর জর্জরিত হতে হত না। অবশ্য তার একটি ভয়ঙ্কর দিকও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়েটি বিয়ের দু বছরের মাথায় বিধবা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাই ভাবি ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।"

(সূত্র; মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা; প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৩৫০)

দুঃসহ কৌতুক

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের ডানপিটে ছাত্র প্রমথনাথ বিশী। অঙ্কের পরীক্ষা। অঙ্কের শিক্ষক নগেন আইচ। দশটার জায়গায় বারটা অঙ্ক করে প্রমথ ভাবলেন ১০০ নম্বরে ১২০ পাওয়ার মত দুরূহ সমস্যার সমাধান মাষ্টারমশাই করবেন

কীভাবে !

বিকেলে ভূগোল পরীক্ষার দ্রাঘিমা আর বিষুবরেখার আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিচারে ব্যস্ত প্রমথ। হঠাৎ হাজির নগেন আইচ। হাতে প্রমথ-র অঙ্ক খাতাটি। প্রমথ ভাবলেন, ১০০য় ১২০ দেওয়ার ধাঁধাঁ-র কোনো সমাধান না পেয়ে মাষ্টারমশাই এসেছেন ছাত্রকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু গম্ভীর গলায় নগেন আইচ জিজ্ঞেস করলেন, "একি করেছ ?" প্রমথ জানতে চাইলেন কোনো ভুল হয়েছে কিনা।

নগেন আইচ বললেন, "ভুলের কথা হচ্ছে না। ভুল ছাড়া তুমি কি করবে। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় এটা কী ?" দশটির জায়গায় বারটি অঙ্ক করে, তার সবকটির ভুল উত্তর দিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় প্রমথ একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

কাণ্ড দেখে কয়েকজন শিক্ষক এসে জুটলেন। নগেন আইচ এই ভয়ঙ্কর বিষয়টি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে অঙ্কের খাতায় স্বরচিত কবিতা লেখার মত গুরুতর অপরাধের কোনো যথাযোগ্য শাস্তি খুঁজে পেলেন না। অতএব অঙ্ক খাতা গেল শান্তিনিকেতনের সুপ্রিম কোর্ট -- মহামান্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হাতে।

গুরুদেব খাতাটা আগাগোড়া দেখলেন। বললেন, "নগেন, অঙ্কগুলো তো হয় নি দেখাই যাচ্ছে।, কিন্তু যাই বল বাপু, কবিতাটা কিন্তু বেশ হয়েছ। আহা, কি সরল স্বীকারোক্তি ও আন্তরিকতা। শোনো না –

হে হরি, হে দয়াময়
কিছু মার্ক দিও আমায়
তোমার শরণাগত
নহি সতত
শুধু এই পরীক্ষার সময় -- !

রবীন্দ্রনাথ আরো বললেন, ওর বয়সের কথা ছেড়ে দাও। এমন কজন প্রবীণ ভক্ত কবি আছে যে প্রশ্নপত্রের দশটি অঙ্কের উদ্যত খাঁড়ার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে আত্মনিবেদন করতে পারে। ওকে অঙ্ক কষাতে চেষ্টা কর -- তা বলে কবিতা লেখায় বাধা দিয়ো না।"

অতএব গুরুদেবের রায়ে বেকসুর খালাস হলেন প্রমথ। শিক্ষক নগেন আইচ প্রমথর অঙ্কের খাতা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন , "নাও, এখন থেকে অবাধে কবিতা লিখে যাও, কেউ বাধা দেবে না "

(সূত্র; প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, কলকাতা -- বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৫১)

তোমার পরশ আমার মাঝে

শান্তিনিকেতনে পরীক্ষার সময় একবার একটি মেয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলল, "আজ বাংলা পরীক্ষা, আমার কলমে একবারটি লিখে দিন আপনি তাহলে অনেক নম্বর পাব আমি।" রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে কলমটি দিয়ে লিখতে লিখতে বললেন, "তুই তো জানিস নে পরীক্ষায় আমি কোনোদিন পাশ করি নি। আমার হাতে লিখিয়ে শুধু চটিয়ে দিলি পরীক্ষা সরস্বতীকে।" মেয়েটি বলল, "অন্য বিষয়ের দিন তো কলম দিই নি, বাংলার দিনে দিয়েছি। আপনি যে বাংলা খুব ভাল জানেন।" রবীন্দ্রনাথ খুব মজা পেলেন। কলমটা ফেরৎ দিয়ে মেয়েটিকে স্নেহের সঙ্গে বললেন, "তবু ভাল যে বাংলা অন্তত জানি, না রে ? নইলে কি হত আমার ?"

(সূত্র -- নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ছোটদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু বসু ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত, নানাজনের রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০৩)

নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে

১৯১৬। প্রথমবার জাপান ভ্রমণে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। টোকিয়ো স্টেশনে তাঁকে দেখতে ঐতিহাসিক ভিড়। কবি আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই টোকিয়োর স্টেশন মাস্টারের ঘরে বাবার কোলে চড়ে একটি কাঠের স্তম্ভে মালা পরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনার মহড়া দিয়েছে তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে আকিকো। আকিকোর বাবা য়াসুরোকু সোয়েজিমা ছিলেন জাপানে রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সদস্য। নির্দ্দিষ্ট দিনে টোকিয়ো স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন রবীন্দ্রনাথ। তেরো বছরের দিদির কোলে চড়ে তিন বছরের আকিকো রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিল একটি মালা। সে

১৯২৯ সালে জাপানে রবীন্দ্রনাথ। ফুলের তোড়া হাতে কবির বাঁদিকে আকিকো সোয়েজিমা। এই আকিকোই ১৯১৬ সালে ৩ বছর বয়সে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গলায়।

বারই আকিকোর জন্য জাপানি তুলি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন একটি কবিতা –

নবীন শিশুর কোলে
জাপান নবীন
পাঠাইল বরমাল্যখানি
প্রাচীন কবির মুখে
প্রাচীন ভারত
পাঠাইল আশীর্ব্বাদবাণী।

(সূত্র -- কাজুও আজুমা, জাপান ও রবীন্দ্রনাথ; শতবর্ষের বিনিময়, কলকাতা; এন.ই. পাবলিশার্স ২০০৪)

(নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ থেকে সংকলিত) ❑